আশ্রয়

আহমেদ সাবের

এবার ঘরে ফেরার পালা। এবার শেষ বারের মত ঘরে ফেরার পালা শীতের পাখীর। চৈতীর বড় ভাবী আমাদের বলেন শীতের পাখী। ছুটিতে দেশে গেলে, প্রাত্যহিক আড্ডার সময় দেশের কোন সমস্যা নিয়ে আমি কথা উঠালেই, ভাবী ফোড়ন কাটবেন, জামাল, তোমরা তো শীতের পাখী। ছুটি কাটাতে এসেছ কয়েক দিনের জন্য। ছুটি শেষ হলেই উড়াল দেবে। তখন কোথায় থাকবে তোমার দেশ, আর কোথায় থাকবে দেশের মানুষ? আমরা দেশের মানুষ; আমাদেরকে আমাদের সমস্যা নিয়ে থাকতে দাও।

সেই শীতের পাখী এবার সব গুটিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে। আরব দেশের রুক্ষ মাটিতে কাল আমাদের শেষ দিন। বছর চারেক আগে পা দিয়েছিলাম এ দেশের মাটিতে – একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সামনে রেখে। দেশে একটা ছোট খাট কলেজে শিক্ষকতা করতাম। গ্রামের কলেজ। বেতন অতি সামান্য। ধার দেনা করে চলতে হতো মাসের শেষ দিন গুলো। শেষে আমার এক ট্রাভেল এজেন্ট বন্ধু মকবুল পথ ধরিয়ে দিল। ওর চাচা ম্যান-পাওয়ারের ব্যবসা করেন। মকবুল ওনার সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিল। কথা হলো, এক লাখ নব্বই হাজার টাকায় সৌদির ফ্রি-ভিসা মিলবে। টাকা অগ্রিম দিতে হবে। প্লেনের টিকেট মকবুল বাকীতে দিয়ে দিবে। তাতেও এটা ওটা মিলে আড়াই লাখ টাকার ধাক্কা। এর পরেও ওখানে গিয়ে চাকুরীর কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কাজ পাওয়া যায়, তাই করতে হবে। বাবাকে অনেক কষ্টে রাজী করিয়ে এক খণ্ড জমি বিক্রি করা হলো। বউ চৈতীর গহনা বিক্রির পরেও কিছু ধার করতে হলো।

নিজকে বড় স্বার্থপর মনে হয় সবসময়। সংসারের সম্পদে সবার সমান অধিকার। আমার ভবিষ্যতের জন্য আমি সবাইকে তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করলাম। বাবা হয়তো ভাবছেন, ছেলে বিদেশে গিয়ে কাড়ি কাড়ি টাকা পাঠাবে। সংসারে প্রাচুর্যের ঢল নামবে। হায়রে স্বপ্ন। আর আমার ভাবনার তো কোন কুল পাথারই নেই। একদিন সবাইকে পেছনে ফেলে পাড়ি দিলাম সৌদি আরবের জেদ্দার পথে - আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের সন্ধানে; চৈতী আর দু মাসের মেয়ে মুনাকে পেছনে ফেলে রেখে। ফ্রি-ভিসা ওয়ালাদের চাকুরীর কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তাই তাদের সাথে স্ত্রী-সন্তানদের নেয়ার নিয়ম নেই। হায়রে অন্ধ নিয়ম। ঠিক হলো, আপাততঃ বন্ধু হারুনের ওখানে উঠবো। তারপর চাকুরী পেয়ে স্ত্রী-সন্তানকে নেবার অনুমতি পেলে চৈতী আর মুনাকে নিয়ে যাব।

এ যেন সে দিনের কথা। হারুন জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আমাকে উঠাল ওর বাসায়। অজানা অচেনা যায়গা। কত দ্বিধা, কত সংশয়। দেশের চাকুরীটা ছেড়ে এসে ভাল কি মন্দ করলাম। দেশের চাকুরীটাতে বেতন কম; তবু না খেয়ে তো ছিলাম না। এখন সে অবলম্বন টুকুও নেই।

এক দিন, দু দিন করে এক মাস কাটলো, দু মাস কাটলো। চাকুরী আর মিলে না। আমি দিনে দিনে হতাশার পঙ্কে ডুবে যেতে থাকি। হারুন সাহস দেয়; ওর বউ রুমা সাহস দেয়। কিন্তু আমি চারিদিকে শুধু নিরাশার কালো মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না। অবশেষে দু মাস দশ দিনের মাথায় কোন অলৌকিক শক্তির ইঙ্গিতে আমার ভাগ্যে একটা চাকুরী জুটে গেল। একটা ছোট খাট কোম্পানীর একাউন্টেন্ট। নামে একাউন্টেন্ট, কিন্তু কাজে দারোয়ান, পিয়ন, টাইপিষ্ট, ক্যাশিয়ার – সব। এক কথায় অল-ইন-ওয়ান। মাস ছয়েক পরে অনুমতি মিললো, স্ত্রী-কন্যাকে আনার। দেশে গেলাম ওদের আনতে। বাবার হারানো জমি উদ্ধার হলো। দেখলাম, সংসারে আমার কদর বেড়ে গেছে হাজার গুন। বাবা, মা, ভাই আর বোন দের কাঁদিয়ে ফিরে এলাম কর্ম ক্ষেত্রে।

মন্দ ছিলাম না শীতের পাখী। কিন্তু কপালে সুখ সইলো না। সৌদি আরবে আসার প্রায় এক বছরের মাথায় দু হাজার তিন সালে ইরাকের যুদ্ধ বাঁধল। সৌদিরা ও জড়িয়ে পড়লো সে যুদ্ধে। সে যুদ্ধের বিল মেটাতে সৌদিদের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। সরকারী কাজ কর্ম কমে যাবার ফলে আমার কোম্পানীর আর্থিক অবস্থাও খারাপ হয়ে গেল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললো আরো বছর দুয়েক। সরকারী তহবিল থেকে বিলের টাকা আসে না সময় মত। একে একে আমার কোম্পানী থেকে লোক ছাটাই হতে থাকলো। শেষে এসে গেল আমার পালা।

মানুষের স্বপ্ন বোধ হয় এমন করেই ভাঙ্গে। কত স্বপ্ন ছিল। দেশে নতুন ঘর উঠাবো। বোনের একটা ভাল বিয়ে দেব। মুনা বড় হলে ওকে একটা ভাল স্কুলে পড়াব। আমার স্বপ্নের রথ মাঝ পথে এসে থেমে গেল।

বন্ধুরা কেউ কেউ কানাডা পাড়ি দিচ্ছে। কানাডা যেতে টাকা লাগে। আমার হাত খালি। সুতরাং সে পথও বন্ধ। রীতিমত মুষড়ে পড়লাম আমি। অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সামনে রেখে এসেছিলাম যে দেশে, আজ সে দেশ থেকে বিদায় নিতে হবে একই ভাবে। এটাই জীবন।

একমাস ধরে প্রস্তুতি চলছে জিনিষপত্র বাধা ছাঁদার। কিছু বিক্রি, কিছু দান আর কিছু বিসর্জন। এ করে মোটামুটি গুছিয়ে এনেছি। সব ঘর খালি। শুধু ড্রইং রুমে বাক্সের পাহাড়। পাশে দুটো মেট্রেস পাতা; এ দেশ আমাদের শেষ শয্যা। আজকের দিনটাই বাকী। কাল আমরা পাড়ি দেব জন্মভূমির পথে।

এখন বিকেল। আকাশে মেঘ করে আছে বলে মনে হচ্ছে – সন্ধ্যা। মরুভূমির দেশ। বৃষ্টি হয়না বললেই চলে। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ করেই এক পশলা বৃষ্টি নামলো। তাড়াহুড়া করে ব্যালকনির দরজা বন্ধ করতে গিয়ে আমি আর দৃষ্টি ফেরাতে পারলাম না।

শূন্য ব্যালকনিতে একা একা নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে আমার বোগেনভেলিয়া গাছটা। সবুজ পাতা ভিজে ছল ছল বৃষ্টির পানিতে – যেন কাঁদছে। সারা শরীরে ফুলের সমারোহ। বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে। ভিজছি আমি; ভিজছে গাছটা। যেন হাজার বছর ধরে গাছটা আছে এখানে।

হ্যাঁ, যুদ্ধের মাস খানেক আগেই তো কিনেছিলাম গাছটা। এক শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখি, একটা বাচ্চা ছেলে বিক্রি করছে কিছু বোগেনভেলিয়ার চারা। মরুভূমির দেশে ফুলের চারা মিলেনা তেমন। কিছু না ভাবেই কিনে নিলাম একটা।

বাসায় আসতেই চারাটা দেখেই কি আনন্দ চৈতীর। বেচারীর ফুলের খুব শখ। দেশে থাকতে আমাদের বাড়ীতে সুন্দর ফুলের বাগান করেছিল। এখানে থাকি প্ল্যাটে। মাটি কোথায় যে বাগান করবে? তবুও বোগেনভেলিয়ার চারাটা সামনে রেখে একটা প্ল্যানিং সেশন হয়ে গেল আমাদের।

জমি না থাকুক, টবই ভরসা। ভাল ফুলের চারা নাইবা মিললো, বোগেনভেলিয়া দিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে আপত্তি কোথায়? গাছটা কোথায় রাখতে হবে, দিনে কবার পানি দিতে হবে, এ নিয়ে রীতিমত গবেষণা হয়ে গেল। ঠিক হলো, আমাদের বাসার পেছন দিকের ব্যালকনিতে গাছটার আস্তানা হবে। ওখানে পানি দেবার সুবিধা, পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা আছে। তবে বেশী গরম পড়লে গাছ টাকে ঘরে এনে রাখা হবে। আমার চিন্তা, মুক্ত আকাশের নীচের মাটিতে যার বড় হবার কথা, ছাদের নীচে, টবের তোলা মাটিতে তা বাঁচবে তো?

দেখতে দেখতে টবের মাটিতে গাছটা বড় হতে থাকলো আমাদের পরম যত্নে। শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে জেঁকে বসলো দিনে দিনে। সকাল বিকাল ভাল করে দেখি, কোন ফুলের কলি এলো কি না। না, গাছটার পাতাই বাড়ছে, ফুল আর আসে না।

কদিন থেকে ধুলি ঝড় হচ্ছে। বাইরে ভীষণ গরম। ধুলায় চারিদিক অন্ধকার। অফিস থেকে ফিরে দেখি, গাছটা ড্রইং রুমে ঠাই পেয়েছে।

বাইরে গরম আর ধুলার অত্যাচারে গাছটার অবস্থা কাহিল; তাই ঘরে এনে রাখলাম। চৈতীর অজুহাত।

খুব ভাল করেছ। আমিও সায় দেই সাথে সাথে।

আমাদের চৌদ্দ মাসের কন্যা সবে হাটতে শিখেছে। আমার কোল থেকে নেমে গাছটার দিকে এগুতেই হৈ হৈ করে উঠলো চৈতী।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ড্রইং রুমে যেতেই আমার আক্কেল গুড়ুম। গাছটার অর্ধেক পাতাই ঝরে কার্পেটে পড়ে আছে। মনে মনে ভাবলাম, মুনার কাণ্ড। নতুন হাটা শিখেছে। সারাদিন হেটে এঘর ওঘর করছে আর হাতের কাছে যা পাচ্ছে, টেনে নামাচ্ছে। গাছটাকে ভাল মত পরীক্ষা করে দেখলাম, মুনা বেচারীর ঘাড়ে দোষ চাপানো রীতিমত অন্যায়। শুধু নীচের দিকের নয়, উপরের ডালে, যেখানে মুনার হাত পৌঁছানোর কোন উপায় নেই, সেখান থেকেও পাতা ঝরেছে। জানালা দিয়ে বেড়াল এলো নাকি। না, জানালা গুলো বন্ধই আছে। আর বিড়াল এলেও গাছের সাথে লড়তে যাবে কেন? বিড়ালের দৌড় রান্না ঘর পর্যন্ত। আমি আর চৈতী মিলে, আকাশ পাতাল চিন্তা করেও কোন উত্তর খুঁজে পাই না।

শেষে অনেক ভেবে সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, কাণ্ডটা করেছে গাছটা নিজেই। বন্ধ ঘরের বন্দীত্ব গাছটার পছন্দ হয়নি। বনের পাখীর কি সোনার খাঁচা পছন্দ হয়? তাই পাতা ঝরিয়ে নীরব বিদ্রোহ। গাছটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো ও বলছে, আমার আলো চাই, বায়ু চাই। এ বন্ধ ঘরে আমার দম আটকে আসছে।

তাই সই। যা চাও, তাই হবে, বলে সযত্নে টব টাকে ধরে রেখে আসলাম ব্যালকনিতে। বেশ গরম পড়লো কয়েকদিন। ভাবলাম, এ গরমে বোধ হয় বাঁচবেনা গাছটা। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, চৈতীর যত্নে টিকে থাকলো ওটা; গরমের ধকল কমতে শুরু করলে, দিনে দিনে চাঙ্গা হয়ে উঠলো আবার।

শীতকাল এলো গরমের পর। শীতকাল হলেও শীত নেই এখানে। রোদের তেজটা একটু কমে মাত্র। একদিন অফিস থেকে ফিরতেই চৈতী বললো, একটা সু-সংবাদ আছে। দেখি, বলতে পার নাকি।

আমি ভাবতে থাকি। সংবাদটা এখানকার, না দেশের? আমি প্রশ্ন করি। দেখা যাক, প্রসেস অব ইলিমিনেশনে ঘটনার কাছাকাছি যেতে পারি নাকি।

এখানকার। চৈতী মুচকি হেসে জবাব দেয়।
সংবাদটা আমাদের না অন্য কারুর?
আমাদের।
আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল চৈতী। ভাবলাম, আমাদের সংসারে বোধহয় নতুন কেউ আসছে। চৈতীর মুচকি হাসি কি তারই নিদর্শন?
তোমার কি কোন খবর আছে? ওর পেটের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে প্রশ্নটা করলাম আমি।
ধুর বোকা। বলে হেসে উঠলো চৈতী। দেখে যাও, দেখে যাও, বলে টানতে টানতে ব্যালকনিতে নিয়ে গেল আমাকে।
দেখ। বোগেনভেলিয়া গাছটার একটা ডালার দিকে ইঙ্গিত করে বলে উঠলো সে। উত্তেজনা ফেটে পড়ছে চৈতীর চোখে মুখে।
দেখলাম, বোগেনভেলিয়ার একটা ডালের মাথায় দুটো কুঁড়ি। কি আনন্দ, কি বিরাট প্রাপ্তি। দীর্ঘ সাধনার ফল অবশেষে। আমার সারা মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। আমি আনন্দে জড়িয়ে ধরলাম চৈতীকে। এ যেন কালকের ঘটনা।
বাবা, উপর থেকে পানি ছিটাচ্ছে কে? আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করলো মুনা। তারপর উত্তরের তোয়াক্কা না করেই ফুল কুড়াতে লেগে গেল সে। মুনার প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পাই আমি। সন্ধ্যা নামছে। অন্ধকার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। আমি আবার ভাবনায় ডুবে যাই।
কি হচ্ছে ওখানে বাপ, বেটিতে? চৈতীর ডাকে চমকে উঠলাম আমি।
সব কিছুরই তো গত হলো। কিন্তু শুধু গাছটার কোন গতি হলো না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম আমি।
অনেককেই তো বললাম; কেউ রাজী হলো না। চৈতীর কণ্ঠে হতাশা।
অন্য সব জিনিষইতো সবাই বলবার আগেই ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে গেল। শুধু গাছটা নেবার বেলায় কেউ নেই। রেগে যাই আমি।
এ ঝামেলা কেউ নিতে চায় না; পানি দাও, যত্ন কর।
এটা ঝামেলা হলো? খাওয়াটাও তো ঝামেলা। তবে খাও কেন? যত সব বাঙ্গালের দল। ফুলের মর্ম বুঝবে কি? দেখি আমজাদকে বলে গাছটার একটা গতি করা যায় কিনা। বলে গট গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি।
আমজাদ আমাদের বিল্ডিং এর দারোয়ান কাম কেয়ার টেকার। লম্বা চওড়া পাঞ্জাবী। থাকে নীচের তলায় একটা রুমে। বিল্ডিং এর পেছনের পুরো যায়গাটা ওর জিম্মায়। ওকে গিয়ে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলতেই সে বলে উঠলো,
আব ঘাবড়াইয়ে মাত। ম্যায় কাল সুবেমে ইসকো ডাষ্টবিনমে ফেক দেঙ্গে।
সোজা বাংলায়, আপনি ঘাবড়াবেন না। কাল সকালে আমি ওটাকে ডাষ্টবিনে ফেলে দেব। শুনে রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ও তড়বড় করে আরো অনেক কথা বলে যেতে লাগলো। তার এক বর্ণও আমার কানে ঢুকলো না। বলে কি ব্যাটা পাঞ্জাবী ভুত? ব্যাটার কাছে এসেছিলাম, সমস্যার একটা সমাধান চাইতে। আর ব্যাটা একেবারে একটা সোজা পথ বাতলে দিল। নীচে কত যায়গা; বিল্ডিং এর এ মাথা থেকে ও মাথা। একটা কোনে রেখে দিতে পারতো গাছটা। তা না; ব্যাটা বুদ্ধু বলে কিনা - ডাষ্টবিনমে ফেক দেঙ্গে।

ওকে আর কিছু না বলে, যেমন করে এসেছিলাম, তেমন করেই ঘরে ফিরে এলাম আমি। আমার চেহারা অবস্থা দেখে চৈতী আর কাছে ঘেঁষল না। আমি ড্রইং রুমে মুখ প্যাঁচার মতো করে বসে থাকলাম। মুনা আমার সাথে গল্প করার বৃথা চেষ্টা করে, আমার পায়ের কাছে বসে আপন মনে খেলতে লাগলো।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। একে একে বন্ধুরা আসতে লাগলো। আজ শেষ রাত। গত কয়েকদিন বন্ধুদের বাসায় দাওয়াত খেয়ে বেড়িয়েছি। আজ ঠিক করেছি, কারও বাসায় যাবনা। বন্ধুদের কেউ কেউ শেষ দেখা করতে আসবে। হারুন এলো টিফিন ক্যারিয়ার হাতে খাবার নিয়ে। পেছনে রুমা আর ওর দু মেয়ে। নাছোড়বান্দা হারুন আর রুমা। শেষ রাতের খাবারটা খাওয়াবেই খাওয়াবে।

শোবার ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে সবাই খেতে বসলাম। আমাদের আরেক বন্ধু আকবর ভাই, উনিও যোগ দিলেন সপরিবারে। বাকী অভ্যাগতরা ড্রইং রুমের মেঝেতে বসে আড্ডা দিতে লাগলেন। হারুনের মেয়ে দুটো মুনার সাথে শেষ বারের মতো খেলায় মেতে উঠলো। কাল যে মুনা এ বাসায় আর থাকবে না, এটা ওদের মনেই আসছে না। কাল এ সময় আমরা থাকবো প্লেনে, তিন বছরের স্মৃতিকে পেছনে ফেলে। সবাই আমাকে এটা সেটা প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি হু হ্যাঁ করে উত্তর দিলাম। গল্প আর জমলো না। আমার সারা অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রাখলো বোগেনভেলিয়া গাছটা।

কি ভাই, আপনার শরীরটা খারাপ নাকি? আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন আকবর ভাই।

শরীর খারাপ তো হবেই। যা ধকল গেছে এ কটা দিন। উত্তর দেয় রুমা।

ভাগ্য ভাল, আপনারা সবাই মিলে সাহায্য করেছেন। আর হারুন ভাইর তো কথাই নেই। উনি না থাকলে কি যে হতো। চৈতীর উত্তর দেবার পালা এবার।

খাবার পর্ব শেষ। সবাই ড্রইং রুমের কার্পেটে বসে আড্ডা দিচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কি করে হারুনের কাছে কথাটা শেষ বারের মতো পাড়া যায়। হারুন আমার ছোট বেলার বন্ধু। এক সাথে স্কুলে গেছি, কলেজে পড়েছি। এখানে আসার পর আমাকে সে কত ভাবে সাহায্য করেছে। আমার শেষ অনুরোধটা সে অবশ্যই রাখবে। ... না, না, সে রাখবেনা। নিজের মনেই দ্বন্ধ বাধে আমার।

ওকে তো আগেই অনুরোধ করেছিলাম, ফুল গাছটা তুই রাখ হারুন। কত সুন্দর ফুল হয়। বারান্দার এক কোনে রেখে দিবি। মাঝে মাঝে একটু পানি দিবি। এটা তো কোন কঠিন কাজ না।

সে উত্তর দিয়েছিল, না রে, রুমা রাজী হবে না। তাও গোলাপ টোলাপ হলে কথা ছিল।

সে তো একবার না করে দিয়েছে। তার পরেও তাকে আবার কি করে বলি। দ্বিধায় পড়ে যাই আমি। না, আমাকে পারতেই হবে। শেষ বারের মতো অনুরোধ করে দেখি। দেখা যাক, কি হয়। এক ফাকে ব্যালকনিতে ডেকে নিয়ে এলাম হারুনকে।

দোস্ত, আমার শেষ অনুরোধটা তোর রাখতে হবে। বললাম আমি।

হারুন আমার ইঙ্গিতটা বুঝলো। একটা গাছ বইতো আর কিছু না। বলে উঠলো হারুন। ওটা নিয়ে চিন্তা করিস না। কাল না হয় পরশু ওটার একটা ব্যবস্থা করবো আমি। কোথাও ফেলে দিয়ে আসবো। এটা কোন সমস্যা হলো নাকি?

অভিমানে আমার কান্না পেতে লাগলো। ব্যালকনির অন্ধকারে, অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রাণপণে কান্না চাপতে লাগলাম আমি। নিজকে ভীষণ তুচ্ছ মনে হতে লাগলো আমার। হারুন কিছু একটা

বললো। কিন্তু আমার কানে কিছুই ঢুকলো না। আমাকে অন্ধকারে একা রেখে ঘরের ভেতর ফিরে গেল হারুন। আমি ভাবনার স্রোতে তলিয়ে গেলাম। আল্লাহ, মানুষ নাকি আশরাফুল মখলুকাত। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের এত শক্তি। মানুষ কত কিছু করতে পারে। আমি মানুষ হয়ে সামান্য একটা গাছকে আশ্রয় দিতে পারলাম না। আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগলাম আমি।
কতক্ষণ কেটেছে জানি না। এক সময় চৈতী এসে আমার হাত ধরলো। আমি নেশাগ্রস্থের মতো ওর হাত ধরে ঘরে ফিরে এলাম। বন্ধুরা বিদায় নিতে থাকলো একে একে। শেষ পর্যন্ত হারুনরা রয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটা ছুঁই ছুঁই করছে।
হারুনকে বললাম, তোরাও এবার চলে যা। তোর ওতো বিশ্রাম দরকার। তার উপর সকালে তো তোকে অফিসে যেতে হবে।
হারুন বললো, যাব। আর একটু বসি।
হারুনের মেয়েরা কার্পেটের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে মুনার সাথে। হারুন ওদের পাশে চুপচাপ বসে থাকলো। ঘণ্টার কাঁটা বারটার ঘর পেরিয়ে গেল। একটা দিন পেরিয়ে আরেকটা দিনের সূচনা। আমার যাবার দিন চলে এলো।
এমন সময় দরজায় কলিং বেল বাজলো। এতো রাতে কে এলো ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাঃ আশরাফ।
ওনার তো আসার কথা না এতো রাতে। নিয়ম মেনে চলার মানুষ উনি। রাত জাগেন না কখনো। রাত দশটার পর ওনার বাসায় ফোন করা নিষিদ্ধ।
আশরাফ ভাই, আপনি? এত রাতে?
কাল তো চলে যাবেন। ভাবলাম, যাবার আগে একবার দেখা করে যাই। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমতা আমতা করে বললেন আশরাফ ভাই।
তা বলে এত রাতে, এত কষ্ট করে?
না না, কষ্ট কিসের। তা ছাড়া জার্নির টেনশনে অনেকের শেষের দিকে শরীর খারাপ হয়ে নানা বিপত্তি ঘটে। আপনি কাল যাচ্ছেন। শেষ কালে যাতে কোন ঝামেলা না হয়, তাই আজ আপনাকে একটু চেক আপ করে যেতে চাই। ডাঃ আশরাফ বলে চললেন।
যথারীতি পরীক্ষা হলো। প্রেশার, হার্ট বিট, বুক, পিঠ, চোখ, গলা, কিছুই বাদ গেলো না। না, সব ঠিক আছে। ডাক্তার সাহেবের মুখ চলতে লাগলো। তবু সাবধানের মার নেই। টেনশনে রাতের ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে। দুটো ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছি। খেয়ে শুয়ে পড়বেন। কোন কিছু নিয়ে অযথা টেনশন করবেন না।
ডাঃ আশরাফ বিদায় নিলেন আমার কাছ থেকে। হারুন ওনাকে এগিয়ে দিতে গেল। দরজার বাইরে হারুনের সাথে ডাঃ সাহেবের কথা হলো অনেকক্ষণ। হারুন ঘরে ঢুকে চৈতীকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে নীচু গলায় কিছু বললো। চৈতী মাথা নেড়ে সায় দিতে গেল।
এবার হারুনের যাবার পালা। মেয়ে দুটোকে উঠিয়ে ওদের হাত ধরে দরজার বের হলো হারুন। পেছনে রুমা।
গাছটা নিয়ে চিন্তা করিস না জামাল। ওটা আমি কাল নিয়ে যাব। ফিস ফিস করে বললো হারুন। এখন আমাদের বিদায় দে। কাল দেখা হবে।
হারুনরা চলে গেছে। বেড রুমের ফ্লোরে চাদর বিছিয়ে নিল চৈতী। মুনাকে কোলে করে নিয়ে এক পাশে শুইয়ে দিল।

আমার ঘুম পাচ্ছে। তুমিও শুয়ে পড়। শোয়ার আগে ঘুমের ট্যাবলেট দুটো খেতে ভুলো না। বলতে বলতে শুয়ে পড়লো চৈতী।

আমি ড্রইং রুমে বসে ভাবতে থাকলাম, ঘুমের বড়ি দুটো খাব কি খাব না। গত ক রাত্রি ধরে কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাচ্ছি। বিছানায় যাচ্ছি আর সাথে সাথেই ঘুম। হয়তো ঘুমটা ক্লান্তিজনিত। এত দিন ঘুমের বড়ি না খেয়ে দিব্যি ঘুমাচ্ছি; আজ খেতে হবে কেন? শেষ পর্যন্ত ঘুমের বড়ি দুটো না খাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে, বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে এসে দেখি, চৈতীর রীতিমত নাক ডাকছে।

আমিও শুয়ে পড়লাম। রাত বাড়তে লাগলো। ঘুম আর আসে না। গত কদিন বিছানায় যাবার সাথে সাথেই চোখ জুড়ে নামতো ঘুমের প্লাবন, আজ দু চোখে রাজ্যের খরা। ডাঃ আশরাফকে হারুনই যে ডেকে এনেছিল, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমার প্রচণ্ড রাগ হলো ওর উপর। হঠাৎ শেষ কালে বোগেনভেলিয়া গাছটা নিতে রাজী হলো কেন সে? সত্যিই কি গাছটা রাখবে সে, না আমি চলে যাবার পর ফেলে দেবে আস্তাকুড়ে? একটা বিভ্রমের মাঝে পড়ে ঘুরপাক খেতে থাকলাম আমি।

বিশাল মরুভূমির মাঝ দিয়ে চলছি আমরা – আমি, চৈতী আর মুনা। ধুসর বিকেল। দিগন্ত ছুঁই ছুঁই করছে বিরাট চাকার মতো লাল সূর্য। এ মরুভূমির মধ্যে কখন এলাম আমরা আর কি করেই বা এলাম? মুনা আমার হাত ধরে হাঁটছে, পাশে চৈতী। দিগন্ত বিস্তারী বালু থেকে আসছে উত্তপ্ত হাওয়া; চোখে মুখে লাগছে আগুনের হল্কার মতো। গরমে ঘেমে গেছি আমি। মুনা হাত ধরে টানছে, আর বলছে, চল বাবা চল, একটা জিনিষ দেখাবো তোমাকে। আমরা চলছি আর চলছি। একটার পর একটা ডিবি পেরিয়ে এগুচ্ছি আমরা। ডিবির গায়ে বাতাস লেগে যেন ঢেউ খেলছে। অল্প বাতাসে পুকুরে যেমন ঢেউ খেলে, তেমনি। আশে পাশে কাঁটা গাছের ঝোপ। একটা উট কাঁটা গাছের ঝোপে মুখ দিয়ে আপন মনে কাঁটা চিবাচ্ছে। দূরে চরে বেড়াচ্ছে এক পাল ভেড়া।

আর কত দূরে যাবরে মা? আমার কণ্ঠে ক্লান্তির পাহাড়।

এসে পড়েছি বাবা। ওই দেখ। একটা ডিবির দিকে হাত তুলে দেখায় মুনা।

ওটা, ওটা কি? ভীষণ অবাক হয়ে যায় আমি। ওই তো, ওটাই তো আমার বোগেনভেলিয়া। এ বিশাল মরুভূমির মাঝখানে গাছটা এলো কি করে? তবে কি হারুন .....? কি বিষণ্ণ আমার বোগেনভেলিয়া। সব পাতা আর ফুল ধুলোয় ঢাকা। হঠাৎ দেখি বোগেনভেলিয়াটা দূরে সরে যাচ্ছে। গাছটাও কি হাঁটছে? মাইলের পর মাইল, অনন্ত কাল ধরে? কি খুঁজে বেড়াচ্ছে আমার বোগেনভেলিয়া? হয়তো বা একটা নিরাপদ আশ্রয়।

সিডনী, অক্টোবর ৫-৭, ২০০০

গল্পটি সিডনী থেকে প্রকাশিত মাসিক প্রবাহ পত্রিকার ৫ম বর্ষ ১ম (নভেম্বর ২০০০) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।